বাংলাদেশী বনাম বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ

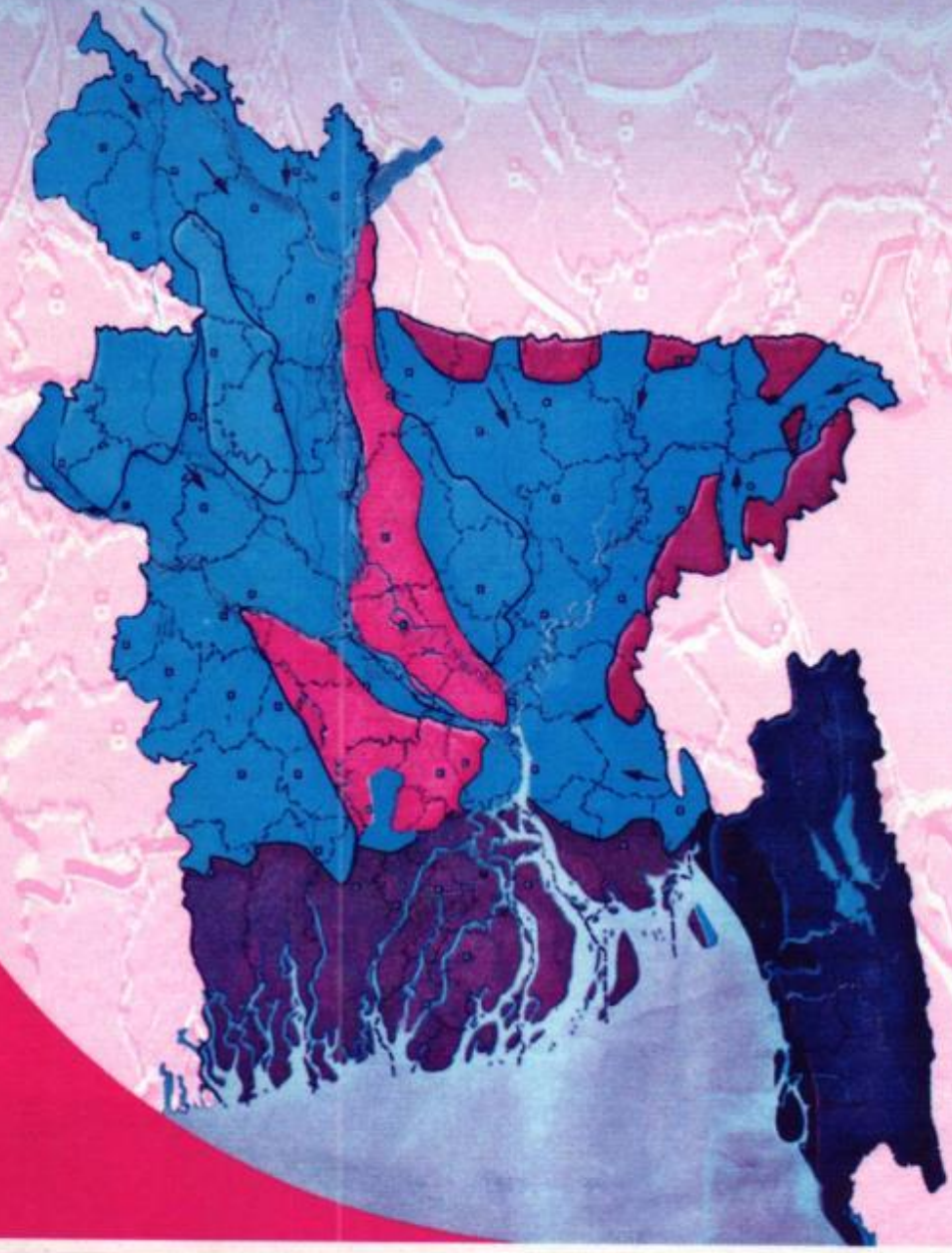

আবদুল খালেক

বাংলাদেশী বনাম
বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ

আবদুল খালেক

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২

আঃ প্রঃ ২৯৮

১ম প্রকাশ

সফর	১৪২৩
বৈশাখ	১৪০৯
মে	২০০২

বিনিময় ঃ ১৩.০০ টাকা মাত্র

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

BNGLADESHE BONAM BANGALI JATIOTABAD by Abdul Khalaque. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka. 13.00 Only.

শুরু কথা

ইংরেজদের আগমনের পূর্বে মুসলমানরা সাত'শো বছর উপমহাদেশের অধিকাংশ এলাকা শাসন করে। মুসলমানদের সময়েই এখানে এক রাজ্য ভিত্তিক একটি ব্যবস্থার ভিত্তি গড়ে ওঠে। ইংরেজরাই সমগ্র উপমহাদেশকে এক শাসনাধীনে এনে প্রায় দু'শো বছর শাসন করে। কিন্তু এই এক শাসনের ফলে এক জাতীয়তাবোধ ও জাতীয়তাবাদে আর্যদের হাজার হাজার বছরের আগ্রাসী মনোভাবের ফলে বহিরাগত সকল জাতিসত্তাকে এক জাতিত্বে বিলীন করার কৌশল সফলকাম হলেও মুসলমানরা প্রথম থেকেই তাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়। ইংরেজের দু'শো বছরের শাসনামলে মুসলমানদের মধ্যে এ পৃথক জাতীয়তাবোধ আরো প্রবল হয়ে ওঠে। এর আর একটা বিশেষ কারণও ছিল। ইংরেজদের অপেক্ষাকৃত উন্নত মুশরিকানা সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে উনবিংশ শতকের হিন্দু সমাজে ব্যাপক জাগরণের সূচনা হয়। হিন্দু জাতীয়তা প্রবলভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। মুসলমানদেরকে এখন বিজিত, দুর্ভাগ্যপীড়িত ও শাসক জাতির কোপানলে নিপতিত দেখে তাদের স্বতন্ত্র জাতিসত্ত্বা বিলীন করার এক চক্রান্ত শুরু করে।

বিশ শতকের শুরু থেকে মুসলমানদের মধ্যে নতুন চেতনার সঞ্চার হয়। আকীদা বিশ্বাস থেকে নিয়ে ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনে সকল প্রকার চিন্তা ও কর্মে নিজেদের স্বাতন্ত্রের ভিত্তিতে তারা একটি পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী উত্থাপন করে। ইংরেজ এ দাবী মেনে নেয়। ফলে ১৯৪৭ সালে তাদের উপমহাদেশ ত্যাগ করার সময় এখানে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান নামে দু'টি নতুন স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। অবিভক্ত ভারতের দশ কোটি মুসলমান আশা করেছিল আল-কুরআন ও সুন্নাহর প্রোজ্জ্বল আলোকে তাদের জীবন পরিক্রমা শুরু হবে নব আজাদী লব্ধ এ নতুন রাষ্ট্রে। ভাষা, বর্ণ, আঞ্চলিকতার আত্মঘাতী প্রভাবের যাদুমায়া কাটিয়ে এ জাতি তার মনযিলে মকসুদের দিকে দৃঢ় প্রত্যয়ে কদম বাড়াবে, এ আশা আর স্বপ্ন-সাধ ছিল তখন অযুত মানুষের মনে।

কিন্তু সে স্বাদ অপূর্ণ রয়ে গেল। কেন ? তার কারণ কি এই নয় যে, ঐ দেশের আমলাতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী ও সমাজতন্ত্রী তথা সকল ইসলাম বিরোধী শক্তি ইসলামী জাতীয়তার উদ্বোধনের পথে বাধার বিন্ধ্যাচল সৃষ্টি করেছিল। অর্থনৈতিক বৈষম্য, প্রাদেশিকতা, আঞ্চলিকতা আর ভাষাগত বিরোধের গোড়ায় পানি ঢেলে— পাকিস্তানের অস্তিত্বকে মিটিয়ে দেবার চক্রান্ত তারা সুপরিকল্পিতভাবেই চালিয়ে ছিল।

সে জামানায় আইয়ুব শাহীর বিরুদ্ধে দেশের সর্বত্র, যে গণআন্দোলন শুরু হয়েছিল, তাকেও বানচাল করার জন্যে একদিকে যেমন খোদাদ্রোহী সমাজতন্ত্রী শক্তি তেমনি অপরদিকে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের মানসপুত্রেরাও অপচেষ্টা চালিয়েছিল। এরই পরিণতিতে আজ আমরা স্বাধীনতা লাভ করার পরও সুখী সমৃদ্ধিশালী ইসলামী আদর্শের অনুসারী জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হতে পারিনি। বরং অবস্থাকে সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে।

দেশ, জাতি ও ইসলামী অদর্শের বৃহত্তর স্বার্থ সংরক্ষণের তাকিদে আজ আমাদের এসব ষড়যন্ত্রকে রুখে দাঁড়াতে হবে। বিদেশী মতবাদের বিষ বাষ্প থেকে জাতিকে রক্ষা করতে হবে। দেশের অখণ্ড সংহতি তথা অস্তিত্ব আর ইসলামী আদর্শের রূপায়ণের জন্যে বাঙ্গালীবাদের কালনাগিনীর ছোবল থেকে এদেশের আপামর জনসাধারণকে বাঁচাতে হবে। জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে কুরআন ও সুন্নার আদর্শিক বুনিয়াদে, এদেশে গড়ে তুলতে হবে ইসলামের সুমহান জাতীয়তার আদর্শে দীক্ষিত সুসংবদ্ধ সুশৃঙ্খল আর স্বচ্ছ জীবন দৃষ্টির অধিকারী মুজাহিদ জাতি।

এ ক্ষুদ্র পুস্তিকায় আমরা বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের স্বরূপ ও বাংলাদেশী জাতীয়তার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছি। এর মাধ্যমে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের মায়াজাল অনেকটা ছিন্ন হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

—লেখক

বাংলাদেশী বনাম বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ

প্রারম্ভিক আলোচনা

আমরা বাংলাদেশী না বাঙ্গালী ? বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর ভারতের সমর্থনপুষ্ট একটি মুখচেনা মহল আমাদের উপর বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ চাপিয়ে দেয়ার প্রয়াসে মেতে উঠেছিল। তারা বাংলাদেশ সরকারের সকল প্রচার মাধ্যমগুলোকেও তাদের এ উদ্দেশ্য সিদ্ধির কাজে ব্যবহার করতে শুরু করছিল। এমন কি স্কুলের পাঠ্য-পুস্তকাদির ভিতর দিয়েও ঐ মহলটি আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদের মস্তিষ্কে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিল। বাংলাদেশের পরবর্তীকালের বিপ্লবী সরকার ঘোষণা করেছেন, আমরা বাংলাদেশী, বাঙ্গালী নই। এ ঘোষণার পর সংশ্লিষ্ট মহলটির মুখ শুকিয়ে গেলেও তারা সন্তুষ্ট নয়। সুযোগ পেলেই তারা বাঙ্গালীত্বের প্রচারে মেতে উঠে।

১৯৪০ সালে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার যে দাবী উঠেছিল তা ভৌগলিক জাতীয়তাকে অস্বীকার করেই শুরু হয়েছিল। মুসলমানেরা একটা স্বতন্ত্র জাতি। দুনিয়ার যে অঞ্চলেই তারা বাস করুক না কেন এবং যে কোনো ভাষাতেই কথা বলুক না কেন ; তাদের জীবন-যাত্রা প্রণালী অভিন্ন। তারা এক অদ্বিতীয় আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতায় বিশ্বাসী। তারা আল্লাহ প্রদত্ত পবিত্র কুরআনকেই আইন ও সংবিধানের উৎস হিসেবে গ্রহণ করে এবং রসূলে করীম (স)-এর শিক্ষাকেই পরম সত্য হিসেবে মেনে চলে। আমেরিকা বা ইথিওপিয়ায় মুসলমান যে পদ্ধতিতে আল্লাহর বন্দেগী করে ঠিক সে পদ্ধতিতেই বাংলাদেশী বা মালয়েশীয় মুসলমানগণ ইবাদাত-বন্দেগী করে থাকেন। নাইজিরিয়ায় মুসলমানের নিকট যা সুখাদ্য বা কুখাদ্য হিসেবে বিবেচিত ঠিক সেসব খাদ্য ভারত, বাংলাদেশ বা ফিলিপাইনের মুসলমানের নিকটেও একইভাবে সুখাদ্য বা কুখাদ্য হিসেবে বিবেচিত। দুনিয়ায় সকল মুসলমানই ভালমন্দ, ন্যায়-অন্যায় ও কল্যাণ অকল্যাণকে একই মানদণ্ড অনুসরণ করে চলে। তাই তারা একটি বিশাল উম্মত, এক বিশ্বব্যাপী ভ্রাতৃত্ব। ভৌগলিক জাতীয়তার সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ হয়ে তারা কূপমণ্ডুক হতে পারে না। আর তা পারেনা বলেই বৃটিশ ভারতে ভৌগোলিক জাতীয়তার ভিত্তিতে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হলে মুসলমানেরা পৃথক হয়ে যায় এবং ভারতভূমিকে বিভক্ত করে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমি দাবী করে।

সমগ্র বৃটিশ ভারতে রামরাজ্য স্থাপনাভিলাসী ব্রাহ্মণ্যবাদী কংগ্রেসী নেতাগণ মুসলমানদের এ দাবী ফুঁৎকারে উড়িয়ে দেয়ার প্রয়াস পায়। কিন্তু তদানীন্তন অবিভক্ত ভারতের ১০ কোটি মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ দাবী প্রত্যাখ্যান করতে ব্যর্থ হয়। তবে তারা তাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কখনও মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র মেনে নিতে পারেনি। ১৯৪৭ সালে যখন বর্তমানের বাংলাদেশ তৎকালে পূর্ব পাকিস্তানরূপে জন্মলাভ করলো তখন এ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচারণকারীদের দেড় কোটি লোকও এখানে রয়ে গেল। শিক্ষা ও অর্থ-বিত্তে তারা ছিল স্থানীয় মুসলমানদের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী। তারা তাই মুসলমানদের ঐক্য বিনষ্ট করার ষড়যন্ত্র শুরু করলো এবং এরই ফলে সাহিত্য ও সংস্কৃতির নামে বাঙ্গালী জাতীয়তার প্রচার শুরু করে দিল।

পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ব্রাহ্মণদের এসব ষড়যন্ত্রের কিছুই টের পায়নি। তারা ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়ে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যে অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছিল তা হিন্দুদের ষড়যন্ত্র প্রসারের আরও সুযোগ করে দিল। ফলে বাঙ্গালী জাতীয়তার উগ্রপ্রচারণা শুরু হয় এবং আইউব ও ইয়াহ্ইয়ার অন্যায় আচরণের ফলে বাংলাদেশের জন্ম হয়। তাতে এমন কোনোই মহাপ্রলয় হয়নি। অবিভক্ত ভারতের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার সঙ্গে পূর্বের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা সংযুক্ত হয়ে যে রাষ্ট্রটি ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান নামে জন্ম নিয়েছিল তা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল মাত্র।

এজন্য তাদের জাতীয়তা পালটিয়ে যায়নি। তার কারণ পূর্ব পাকিস্তান থাকাকালে যে অঞ্চলটি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম এলাকা ছিল সেটিই এখন বাংলাদেশ নামে স্বাধীন হয়ে গেল। এজন্য তাদের জাতীয়তা বদলে যাবে কেন? তারা আবার ভাষা ভিত্তিক বা ভৌগোলিক জাতীয়তা গ্রহণ করে বাঙ্গালী হয়ে যাবে কেন ? তারা আগে ছিল পাকিস্তানী, এবার হল বাংলাদেশী। এটুকুই মাত্র পার্থক্য। ভৌগোলিক আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে জাতীয়তা নির্ণয় করতে হলে বৃটিশ আমলের বাংলা প্রদেশ সম্পূর্ণটিই আমাদের পাওয়া দরকার। তাহলে বলতে পারতাম সম্পূর্ণ বাংলা প্রদেশ (বৃটিশ)-টি যেহেতু স্বাধীন হয়েছে সেজন্য আমরা নিজেদের বাঙ্গালী বলব। অথবা ভাষার ভিত্তিতে যদি আসাম, পশ্চিমবাংলা, মেঘালয়, ও উড়িষ্যায় বাংলা ভাষাভাষী সমস্ত অঞ্চল নিয়ে এ দেশের জন্ম হতো, তাহলেও বলা সম্ভবপর ছিল যে, ভাষার ভিত্তিতে বাঙ্গালী জাতির সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এ দু'য়ের কোনোটিই হয়নি। যা হয়েছে তা হলো ইংরেজ শাসিত বঙ্গ-প্রদেশের যে অংশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের বাসস্থান হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান নামে খ্যাত ছিল, তা বাংলাদেশ নামে স্বতন্ত্র স্বাধীন স্বত্তা

লাভ করেছে। এজন্য আমাদের বাঙ্গালী হয়ে যাবার কোনোই যৌক্তিকতা নেই। আমরা আজও হযরত মুহাম্মদ (স)-কেই আমাদের পথ প্রদর্শক হিসেবে মেনে চলি। বাঙ্গালী চৈতন্য ঠাকুর বা বুদ্ধদেবকে নয়। আমাদের ওঠা-বসা, চাল-চলন শিক্ষা-সংস্কৃতি, ভাল-মন্দ ও কল্যাণ-অকল্যাণের মানদণ্ড পরিবর্তিত হয়নি। আমরা গরুর গোশত খাওয়া যেমন ছেড়ে দিইনি তেমনি জীবজন্তুকে জবেহ না করে এক কোপে বলি দিতেও শুরু করিনি। মসজিদ ছেড়ে মন্দিরে যাইনি, পায়জামা ছেড়ে ধুতি পরা শুরু করিনি। তাহলে জাতীয়তাটা বদলে গেল কোন্ জায়গায় ?

অত্যন্ত দুঃখের সাথেই উল্লেখ করতে হয় যে, আমাদের তৎকালীন শাসকদল বাঙ্গালী জাতীয়তার নামে আমাদের উপর হিন্দুয়ানী চাপিয়ে দেয়ার প্রয়াস পায়।

বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের ধুয়া তুলে মুসলমানদের মুখ থেকে কেড়ে নিল নারায়ে তাকবীর— আল্লাহু আকবর, জিন্দাবাদ বদলে দিয়ে নিয়ে এলো জয় বাংলা। এতকাল বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকেরা বলতো, 'জয় মা কালী"! বাঙ্গালী জাতীয়তা মুসলমান যুবকদের মুখে সেই জয়ধ্বনীই তুলে দিল। আর আমাদের মুখ দিয়ে পুরো হিন্দুয়ানী কায়দায় উচ্চারণ করানো হল, "ওমা তোর চরণতলে ঠেকাই মাথা।" মুসলমানের এ মাথা আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে নত হয়নি। কিন্তু বাঙ্গালী জাতীয়তা সে মস্তককে দেশের চরণে ঠেকিয়ে দেয়। সংবিধানে বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম তো তুলে দিলেনই, বাংলা ভাষাতেও "দয়াময় আল্লাহর নামে শুরু করছি" কথাগুলো পর্যন্ত স্থান পেল না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম থেকে রাব্বি জিদ্‌নি ইলমা (আমার রব ! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও!) দোয়াটিকে বিতাড়িত করা হল। স্বাধীনতার জন্য বীরদর্পে লড়াই করে যিনি শাহাদাত বরণ করেছিলেন সে তিতুমীরের নাম চাপা দিয়ে সূর্যসেনকে জাতীর হিরো বানানো হল। অথচ সূর্যসেন কোনোদিন কোনো মুসলমানকে দু'চোখে দেখতে পারতো না। তার দলে কোনো মুসলমানকে সামিল হতেও দেয়নি। কবি নজরুলের সকল ভাল ভাল গজল ও সঙ্গীত বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত হিন্দু ভাবাপন্ন সঙ্গীতটিকেই জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা দেয়া হল। দেশের সংবিধানটিকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ ও রসূল (স)-এর নাম বর্জ্জিত করে রচনা করা হল। ছাত্রাবাস ও শিক্ষাগারগুলো থেকে ইসলাম ও মুসলমান শব্দ ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হল। ফজলুল হক মুসলিম হল ও সলিমুল্লাহ মুসলিম হলগুলোর নাম থেকে মুসলিম শব্দ কেটে দেয়া হল এবং ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের নাম বদলে কবি নজরুল কলেজ নামকরণ

করা হল। এখানেও নজরুল ইসলামের ইসলাম বাদ গেল। পশু সম্পদ রক্ষার নাম করে গো-দেবতার কুরবানী বন্দ করা এবং বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণের বাহানায় হজ্বযাত্রীর সংখ্যা কমানোর সুপারিশ হল।

এ সময় দাউদ হায়দার নামক এক মুসলিম নামধারী কুলাঙ্গার হযরত রসূলে করীম (স)-কে "তুখোর বদমায়েশ" গালি দিয়ে কবিতা লিখলো এবং জনগণের রুদ্র রোষ থেকে তাকে রক্ষা করার জন্য সরকারী নিরাপত্তা দেয়া হল।

জনসাধারণ পরিষ্কারভাবেই বুঝতে পেরেছিল যে, স্বাধীনতার নামে মুসলমানদের ধোঁকা দেয়া হয়েছে এবং তাদেরকে পুনরায় হিন্দুর গোলাম বানানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটা কোনো অপরিকল্পিত বিষয় ছিল না। এদেশের ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজ বাইর থেকে আসা সকল মানুষকেই হিন্দুদের দাসে পরিণত করেছে। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গদগদ কণ্ঠে গেয়েছিলেন ;

শক, হুন দল, পাঠান মোগল
এক দেহে হল লীন।

সত্য কথা এই যে তারা শক, হুনদের তো হিন্দুয়ানীর মধ্যে লীন করে দিয়েছিল এবং তাদের শুদ্র বা দাসে পরিণত করে রেখেছিল। মুসলমানেরা একটা উন্নত সভ্যতার অধিকারী থাকায় তাদের স্বাতন্ত্র হিন্দুত্বের মধ্যে লীন করে দিয়ে শূদ্রে পরিণত করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু ইংরেজদের পদলেহন করে চাকুরী ও ব্যবসায় থেকে মুসলমানদের সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করা হয়েছিল। শতকরা ৫৫জন মুসলমান অধ্যুষিত ইংরেজ শাসিত বাংলা প্রদেশের সর্বত্র ছিল হিন্দুদেরই প্রাধান্য।

তারা কার্যতঃ মুসলমানদের দাস বানিয়ে নিয়েছিল। ১৯০৫ সালে যখন পূর্ব বাংলা ও আসাম নিয়ে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের সিদ্ধান্ত হয় তখন হিন্দু সমাজ ক্ষেপে উঠে। কারণ, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ নবগঠিত প্রদেশের ব্রাহ্মণ্যবাদী শোষণ আর চলবে না। তাই তারা "বঙ্গমাতা"-কে অখণ্ড রাখার আন্দোলনে তৎপর হয়ে উঠলো। ঐ সময়ই হিন্দু যুবকেরা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন শুরু করেছিল। অনেক ঝড়-তুফানের পর ১৯১১ সালে বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত হয়ে যায় এবং হিন্দু নেতাদের মনে স্বস্তি ফিরে আসে। ১৯৪৭ সালে যখন এ বাংলাদেশেই পূর্ব পাকিস্তান হল তখন হিন্দু নেতাগণই শোরগোল করে তাদেরই 'বঙ্গমাতা'-কে দ্বিখণ্ডিত করতে দ্বিধাবোধ করলো না।

পাকিস্তানের জন্মকে তারা কোনোদিনই ভাল চোখে দেখেনি। আমরা যখন বৈষম্যের প্রতিকারের জন্য রাজনৈতিক সংগ্রাম করছিলাম ঠিক সে সময় স্বতঃপ্রনোদিত হয়ে রাজনৈতিক সংগ্রামকে একটি সশস্ত্র যুদ্ধে রূপান্তরিত করণে ভারতের ভূমিকা ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরবর্তী ঘটনাবলী থেকেই তাদের মনোভাব স্পষ্টরূপে বুঝা যায়। বিশেষ করে খালেদ মুশাররফের অভ্যুত্থানের সময় কোনো বিষয়ই আর গোপন থাকেনি। খালেদ মুশাররফের মৃত্যুর পর থেকে আজ পর্যন্ত ভারত বাংলাদেশের সঙ্গে গঙ্গার পানি বণ্টন, সীমান্ত সংঘর্ষ ইত্যাদির মধ্যে দিয়েও তাদের ঘৃণ্য মানসিকতার প্রমাণ দিয়েছে। সুতরাং বাঙ্গালী জাতীয়তার আবরণে ভারত যে দুরভিসন্ধি পোষণ করছিল তা আজ আর কারো কাছেই অজানা নয়।

বৃষ্টিশ আমল থেকেই হিন্দু লেখক ও সাহিত্যিকগণ বাংলাভাষী মুসলমানদের সম্পর্কে বিরূপ ও বিদ্বেষাত্মক প্রচারণা চালিয়ে এসেছে। তারা মুসলমানদের সর্বদাই "ছোটলোক" চোর, ডাকাত, অস্পৃস্য, হিন্দু মেয়ে হাইজাকার ইত্যাদিরূপে চিত্রিত করার প্রয়াস পেয়েছে। হিন্দু লেখক ও সাহিত্যিকগণ তাদের সে ট্রাডিশন আজও বহালে রেখেছে। পশ্চিম বাংলার সাহিত্যে আজও মুসলমানদের 'ভদ্রলোক' বিবেচনা করা হয় না তবু আমাদেরই ঘরে জন্ম নিয়ে একদল লোক 'বাঙ্গালী' হতে এত আগ্রহ প্রকাশ করছে যে, তা দেখে অবাক হতে হয়।

বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের স্বরূপ

বাঙ্গালী জাতীয়তা ভারতীয় জাতীয়তারই শাখা বিশেষ। আর এ ভারতীয় জাতীয়তা হিন্দু জাতীয়তারই নামান্তর। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও অন্যান্য কোটি কোটি হিন্দু দেব-দেবী সবাই ভারতীয়। হিন্দু ধর্মের যাবতীয় পূজা-পার্বণও ভারতীয় পরিবেশেরই অনুকূল। এমনকি স্বয়ং "ভারত মাতা"ও তাদের কোটি কোটি উপাস্য দেব-দেবীর মধ্যে শামিল রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই হিন্দু কবিরা "দেশের কুকুরকে" "বিদেশের ঠাকুরের" চাইতেও বেশি ভালবেসেছেন। তাই বাইরের দুনিয়ায় হিন্দু জাতি ভারতীয় হিসাবে পরিচয় দেয় এবং দেশের অভ্যন্তরে প্রদেশ ও ভাষার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীতে বাঙ্গালী, মাদ্রাজী ইত্যাদি ধরনের উপজাতীয়তা গড়ে তোলে।

ভৌগলিক জাতীয়তার ভিত্তিতে হিন্দু ধর্মের সূচনা হয়েছিল বলে ভারতের বাইরের কোনো মানুষকে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করা এ ধর্মের পক্ষে সম্ভব ছিল না। উগ্র জাতীয়তাবাদের নেশায় বিভোর হয়ে ভারতীয় হিন্দুগণ বহির্ভারতের সকল মানুষকে অসভ্য, অপবিত্র ও অস্পৃশ্য বলে ঘোষণা করে। হিন্দু ধর্ম মতে বিদেশ যাত্রা মহাপাপ! এসব কারণে কোনো অহিন্দুর পক্ষে হিন্দু ধর্মের সংকীর্ণ গণ্ডীতে প্রবেশ করা কিছুতেই সম্ভবপর ছিল না, আজও নেই। ভারতীয় ব্রাহ্মণগণ এতেও সন্তুষ্ট হয়নি। তারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার জন্য হিন্দু ধর্মের মধ্যেও বিভিন্ন শ্রেণী সৃষ্টি করে তাদের বিভক্ত করে রেখেছে।

ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারের ফলে ভারতের মানুষ সর্বপ্রথম বুঝতে পেরেছিল যে, মানুষে মানুষে বৈষম্য সৃষ্টি স্রষ্টার কাজ নয়। বরং ব্রাহ্মণরাই মানুষকে পদানত করে রাখার উদ্দেশ্যে এ বিভেদ সৃষ্টি করেছে। একমাত্র ইসলামই মানুষকে শুনিয়েছে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের অমীয় বাণী। স্বাভাবিকভাবেই হিন্দু সমাজের চিন্তাশীল ও যুক্তিবাদী মানুষ এ বাণীর প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করে। ব্রহ্মণগণ দেখতে পায় তাদের শোষণের শিকার সাধারণ হিন্দু সমাজের লোক ইসলাম কবুল করে মুসলিম সমাজে সমানাধিকার লাভ করছে। এভাবে যদি সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বাণীতেই আকৃষ্ট হয়ে সকল হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করে বসে তাহলে ব্রাহ্মণগণ কার ঘাড়ে 'দেব সেবা' লাভ করবে ? তাই তারা নিজেদের স্বার্থেই সওয়ার হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য প্রচারণায় লিপ্ত হয়।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রচার করে সাধারণ হিন্দুদেরকে মুসলমানদের সংস্পর্শ থেকে পৃথক করে রাখাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। এ জন্যই বাঙ্গালী হিন্দু ব্রাহ্মণগণ কখনও মুসলমানদের বাঙ্গালী হিসাবে স্বীকার করেনি। এরা শুধু হিন্দুদেরই 'বাঙ্গালী' আখ্যা দান করেছে। আর মুসলমানদের বলেছে, "নেড়ে", "যবন", "ম্লেচ্ছ" "কুলাংগার" ইত্যাদি। খুব বেশি হলে শুধু 'মুচলমান' বা মুসলমান' বলতো। কিন্তু কখনও মুসলমানদের বাঙ্গালী হিসেবে পরিগণিত করেনি। বাংলা সাহিত্যের কয়েকজন নামকরা লেখকের উদ্ধৃতি আমরা নিম্নে পেশ করছি। তা থেকে সহজেই হিন্দুদের এ মনোভাবের সাথে পরিচয় ঘটবে।

(১)–"বাঙ্গালীরা জাতের গুমর সর্বদা করিয়া থাকেন, কিন্তু কর্ম পড়িলে যবনও* বাপের ঠাকুর হইয়া উঠে।"–(টেকচাঁদ ঠাকুররের "আলালের ঘরের দুলাল" ৪৫)

(২)–"আত্মজাতি গৌরাবান্ধ, মিথ্যাবাদী হিন্দুদ্বেষী মুসলমানের কথা যে বিচার না করিয়া ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করে সে বাঙ্গালী নয়।"–(বঙ্কিম চাটার্জী সম্পাদিত মাসিক 'বঙ্গদর্শন' অগ্রহায়ণ, ১২৮৭ বাংলা ৩৭৬ পৃঃ)

(৩)–"সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখতিয়ার খিলজী বাংলা জয় করিয়াছিল, একথা যে বাঙ্গালী বিশ্বাস করে সে কুলাঙ্গার।'–(বঙ্গদর্শন–ঐ ৩৮৭ পৃঃ)

(৪)–"এদিকে পৌরস্ত্রীগণ নন্দাকে পরামর্শ দিতে লাগিল, মা, তুমি এক কাজ কর—সকলের প্রাণ বাঁচাও। এই পুরী মুসলমানদের বিনা যুদ্ধে সমর্পণ কর—সকলের প্রাণ ভিক্ষা মাগিয়া লও। আমরা বাঙ্গালী মানুষ, আমাদের লড়াই, ঝগড়ায় কাজ কি মা ?"–(বঙ্কিম চাটার্জী–সীতারাম ১৮০ পৃঃ)

(৫)–"ইতিহাসের পাঠক মাত্রই অবগত আছেন, উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় রাজারা অত্যন্ত পরাক্রান্ত ছিলেন। এই গঙ্গাবংশীয়দের আদি পুরুষ বাঙ্গালী। তমলুক ও মেদিনীপুর প্রদেশে এদের আবাস ছিল। হনটর সাহেব লিখেছেন ঃ "বিষ্ণুপুরের রাজাগণ মুসলমানদের হইতে আপনাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছিলেন। অতএব বাঙ্গালী পূর্বে নিতান্ত ক্ষুদ্র ছিল না।'–(বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১২৮৫ বাংলা ২২৯ পৃঃ)

(৬) "আমরা বাঙ্গালী—চিরকাল পৌত্তলিক—পৌত্তলিকতা আমাদের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে। আমাদের অস্তিমজ্জার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে—শুধু আধ্যাত্মিক উপাসনায় আমাদের তৃপ্তি হয় না।"–(বঙ্গদর্শন, কার্তিক–১২৮৫ বাংলা ৩১৮ পৃঃ)

(*) মুসলমান অর্থে যবন

(৭) "ইস্কুলের মাঠে বাঙ্গালী ও মুসলমানদের ফুটবল ম্যাচ।'–(শ্রীকান্ত ১ম খণ্ড শরৎ চাটার্জী। পাকিস্তানী সংস্করণ ৭ম পৃঃ)

(৮) "শারীদীয় পূজা বাঙ্গালীর সবচেয়ে বড় উৎসব।*

* * * * * * * * *

"শিলংয়ের বাঙ্গালী অধিবাসীগণের পক্ষে হেম চেয়েছিলেন শুধু আমার কাছে আশীর্বাদ।"–(পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী, শরৎ চট্টোপাধ্যায়–২৪২ পৃঃ)

(৯) "শুধু তব নাম আজি পিতৃলোক হতে এল নামি,
করিল আহ্বান–
মুহূর্তে হৃদয়াসনে তোমারেই বরিল, হে স্বামী
বাঙ্গালীর প্রাণ।"

* * * * * * * *

* * * * * * * *

'ধ্বজা করি উড়াইব বৈরাগীর উত্তরী বসন–
দরিদ্রের বল।
'এক ধর্মরাজ্য হবে ভারত' এ মহাবচন
করিব সম্বল ॥
মারাঠির সাথে আজি, হে বাঙ্গালী, এক কণ্ঠে বলো
'জয়তু শিবাজী'।
মারাঠির সাথে আজি, হে বাঙ্গালী, এক সঙ্গে চলো
মহোৎসবে আজি।"

–('শিবাজী উৎসব', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

উপরে টেকচাঁদ ঠাকুর (প্যারীলাল মিত্র), বঙ্কিম চাটার্জী, শরৎ চাটার্জী, কবি রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের যেসব উক্তি নকল করা হয়েছে সেগুলো স্পষ্ট ভাষায় একমাত্র হিন্দুদেরই 'বাঙ্গালী' নামে পরিচয় দিচ্ছে বাংলা সাহিত্যের মাত্র কয়েকজন নামজাদা সাহিত্যিক ও কবির লেখা এখানে উদ্ধৃত করা হলো। হিন্দু লেখকদের প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি থেকে অসংখ্য উদ্ধৃতি পেশ করে

(*) বাঙ্গালী সেজে আমরা কি শারদীয় পূজা করতে প্রস্তুত ?

আমরা প্রমাণ করতে পারি যে, হিন্দু সম্প্রদায় কখনও মুসলমানদের বাঙ্গালী বিবেচনা করেনি। বাঙ্গালী, শব্দ দ্বারা হিন্দু সমাজ শুধু তাদের নিজেদেরই পরিচয় দান করতো। আর মুসলমানদের অত্যন্ত নিকৃষ্ট জাতি হিসাবেই বিবেচনা করত।

অপরদিকে মুসলমান জাতিও নিজেদের বাঙ্গালী পরিচয় দিতে প্রস্তুত ছিল না। কেননা, তারা একটা উন্নত জীবনাদর্শে বিশ্বাসী। হিন্দু ধর্মে প্রকৃতপক্ষে কোন সুষ্ঠু জীবন বিধানই নেই। এ ধর্মে মানুষে মানুষে রয়েছে বিভেদ সৃষ্টির রীতি। এক শ্রেণীর হিন্দু অপর শ্রেণীর অঙ্গ স্পর্শে অপবিত্র হয়ে যায়। এরা মাটির প্রতিমা, পাথর, গাছ ও জীব-জন্তুর নিকট মাথা নত করে এবং এদের পূজার্চ্চনায় মূল্যবান মানব জীবনকে হেয় প্রতিপন্ন করে। কিন্তু মুসলমান এত নীচে নেমে যেতে প্রস্তুত ছিল না। মিঃ উইলিয়াম হান্টার লিখিত "দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস্" পুস্তকের ১৭৭ পৃষ্ঠায় (বাংলা অনুবাদ ঃ আবদুল মওদুদ) লেখক বলছেন ঃ

"এক মুসলমান জোতদার অল্পদিন আগে একজন সরকারী কর্মচারীকে বলেছিল, দুনিয়ার কিছুতেই ভুলে যেয়ে আমার ছেলেকে বাঙ্গালী শিক্ষকের নিকট পাঠাতে পারবো না।"

এ বাক্যটি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে জনাব আবদুল মওদুদ ৪২ নম্বর টিকায় লিখেছেন, "বাঙ্গালী শব্দ হিন্দু জাতীয়। আমাদের বাপ-চাচাদেরকেও 'হিন্দু' না বলে 'বাঙ্গালী' বলতে শুনেছি।"

এ যাবত আমরা যা আলোচনা করেছি, তা থেকে দু'টি বিষয় জানতে পারা যায়। প্রথমটি হচ্ছে, মুসলমান একটি আদর্শবাদী জাতি—এ জাতির মধ্যে শামিল থাকা এবং ভৌগলিক অথবা ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ অন্য কোনো সংকীর্ণ জাতীয়তা গ্রহণ করা মোটেই সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ সাবেক বাংলা দেশের যে অংশ বর্তমানে বাংলাদেশ হয়েছে, সে অংশের মুসলমানগণ হিন্দু প্রাধান্যের যুগেও নিজেদের বাঙ্গালী হিসেবে পরিচয় দেননি। আর হিন্দু সমাজ ও মুসলমানদের বাঙ্গালী জাতির মধ্যে শামিল করে নিতে প্রস্তুত ছিল না। এমতাবস্থায় মুসলমান হয়েও যারা আজ 'বাঙ্গালীত্বের' জন্য জান-প্রাণ কোরবান করতে রাজী হয়ে গেছে, তারা নিজের পায়ে নিজেই কুড়ালের ঘা মারছে। তাদের শুভ বুদ্ধি এবং আত্মমর্যাদা জ্ঞানটুকুও লোপ না পেলে তারা একাজ করতে পারতো না।

বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের আন্দোলনে যারা অগ্রণী, তাদের অনেকেই পাকিস্তান আন্দোলনের সময় শিশু ছিল অথবা ১৯৪৭ সনের পরে তাদের জন্ম

হয়েছে। ফলে কোন্ অবস্থায় পাক ভারত উপমহাদেশের দশ কোটি মুসলমান, এক বাক্যে 'পাকিস্তান' দাবীর পেছনে মজবুত হয়ে দাঁড়িয়েছিলো, তা তারা জানতেও পারেনি। আর আমাদের চরম দুর্ভাগ্য এই যে, জাতির নওজোয়ানদের নিকট এ ইতিহাস পেশ করার কোনো ব্যবস্থাই করা হয়নি। বরং আমাদের শিক্ষাগারগুলোতে যা' যা' শিক্ষা দেয়া হয়, তা আমাদের সমাজের ভবিষ্যত যারা—যারা সমাজকে নেতৃত্ব দান করবে, তাদেরকে উল্টোপথেই পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছে। অন্যথায় হিন্দু প্রভাবাধীন বৃটিশ ভারতের পরাধীন মুসলমানগণ যে জাতীয়তা গ্রহণ করতে লজ্জাবোধ করতো; আজ স্বাধীনদেশের সেই জাতীয়তাবাদ কিছুতেই সমাদৃত হতে পারতো না। এ আন্দোলন আমাদের শিক্ষা-নীতির চরম ব্যর্থতাই ঘোষণা করছে।

হিন্দু জাতি শুধু যে, মুলমানদের বাঙ্গালী হিসেবে গ্রহণ করেনি—তা নয় বরং মুসলমানদের বিরুদ্ধে চরম ঘৃণা এবং বিদ্বেষ পোষণও করেছে। বাংলাদেশের চৈতন্যদেবের জন্ম মুসলিম বিদ্বেষের তীব্রতা বৃদ্ধি করেছিল। চৈতন্য চরিতামৃত—আদিলীলা, ১২০ পৃষ্ঠায় চৈতন্য দেবের এ উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

"পাষণ্ডী সংহারিতে মোর, এই অবতার।
পাষণ্ডী সংহারী ভক্তি করিমু প্রচার।"

চৈতন্য ঠাকুরের এ পাষণ্ডী যে, মুসলমান জাতি, তা তৎকালীন বাংলাদেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই জানা যাবে। তথাকথিত 'অবতার' মশায় মুসলমান সম্পর্কে কি ধরনের মনোভাব পোষণ করতেন, তা নিম্নের কয়টি লাইন থেকেই পরিষ্কার বুঝা যাবে ঃ

"একদিন প্রভু চৈতন্যদেব হরিদাসের মিলিলা।
তারে লঞ্চা গেষ্টি তাঁহারে পুছিলা ॥
হরিদাস ! কলিকালে যবন অপার।
গো-ব্রাহ্মণ হিংসা করে মহাদুরাচার ॥
ইহা সবায় কোন্ মতে হইবে নিস্তার।
তাহার হেতু না দেখিয়ে, দুঃখ অপার।
হরিদাস কহে প্রভু ! চিন্তা না করিহ !
যবনের সংসার দেখি দুঃখ না ভাবিহ ॥
যবন সকলের মুক্তি হবে অনায়াসে!
'হারাম' 'হারাম' বলি কহে নামাভাসে !

মহাপ্রেমে ভক্ত কহে 'হারাম' 'হারাম'।
যবনের ভাগ্য দেখ লয় সেই নাম ॥
যদ্যপি অন্যত্র সংকেতে হয় নামাভাস!
তথাপি নামের তেজ হয়না বিনা ॥
(চৈতন্য চরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ৫৬০ পৃঃ)

অর্থাৎ চৈতন্য ঠাকুর তার শিষ্যকে প্রশ্ন করছেন, মুসলমান "দুরাচারের" মুক্তির উপায় কি ? আর ভক্তপ্রবণ ঠাকুরকে সমঝিয়ে দিচ্ছেন যে, মুসলমানেরা "হারাম", "হারাম" বলে রাম নামই উচ্চারণ করছে। কাজেই এ নামের 'বরকতে' তাদের মুক্তি হবে। চৈতন্য চরিতামৃত লেখক "নৃসিংহ পুরাণের" নিম্নলিখিত শ্লোকটিও ঐ একই সঙ্গে নকল করেছেন ঃ

দংষ্ট্রিদংষ্ট্রাহত ম্লেচ্ছো হারামোতি পুণঃ পুণঃ।
উক্তাপি মুক্তিমা প্নেতি, কিং পুণঃ শ্রদ্ধায় গৃণন।"

অর্থাৎ দাঁতাল শুকরের দন্তাহত ম্লেচ্ছ (মুসলমান) বার বার 'হারাম' 'হারাম' উচ্চারণ করেই মুক্তিলাভ করে। তাই শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে রাম নাম উচ্চারণ করলে যে মুক্তি লাভ করা যাবে তাতে সন্দেহ কি ? মুসলমানের কি সম্মান ! মুসলমান বন্য শুকরের দাঁতের ঘায়ে জখম হয়ে 'হারাম' 'হারাম' বলে চীৎকার করে। আর এ 'হারাম' শব্দটি হচ্ছে, 'হা-রাম।। এ-'রামে' কল্যাণেই তাদের মুক্তি হবে!

এবার দেখুন 'বাঙ্গালী' ও বাংলা সাহিত্যের জনক বাবু বঙ্কিম চাটার্জী কি বলেন ঃ

(১) ঢাকাতে দুই চারিদিন বাস করিলেই তিনটি বস্তু দর্শকের নয়ন পথের পথিক হইবে। কাক, কুকুর এবং মুসলমান। এই তিনটিই সমভাবে কলহপ্রিয়, অতি দুর্দ্দম অজেয়। ক্রিয়া বাড়ীতে কাক আর কুকুর। আদালতে মুসলমান। আসামী মুসলমান, ফরিয়াদী মুসলমান, 'সাক্ষী মুসলমান, মোক্তার মুসলমান, মোকদ্দমাও ইজ্জতের। কাক, কুকুর মুসলমান এ তিনই বাংলার সর্বত্র আছে। কিন্তু এখানে কিছু বাড়াবাড়ি। ঢাকা মুসলমান প্রধান নগর। এখানে একটি প্রবাদ আছে।

"কাক, কুকুর, নেড়ে
তিন ঢাকা বেড়ে।"
(বঙ্গদর্শন ঃ অগ্রহায়ণ ১২২৭ সাল, ৪০১ পৃঃ)

(২) "মুসলমান বা খৃষ্টান কখনও হিন্দু হইতে পারে না। কেননা, যে সকল আচার হিন্দুত্ব ধ্বংসকারক, তাহারা পুরুষানুক্রমে সেই সকল আচার করিয়া পুরুষানুক্রমে পতিত।"–(বঙ্গদর্শন ঃ চৈত্র ১২৮৭ ঃ "বাঙ্গালীর উৎপত্তি" ৫৬২ পৃঃ)

(৩) "ভবানন্দের উক্তি ঃ হিন্দুরাজ্যে আবার মুসলমান রাজা কি ?"
–(আনন্দমঠ ঃ নবম পরিচ্ছেদ)

(৪) "ধর্ম গেল, জাতি গেল, মান গেল, কুল গেল, এখনতো প্রাণ পর্যন্তও যায়। এ নেড়েদের না তাড়াইলে আর কি হিন্দুর হিন্দুয়ানী থাকে ?"
–(আনন্দমঠ ঃ দশম পরিচ্ছেদ)

(৫) "প্রাচীন রাজা মানসিংহ, রাজা বীরবল, রাজা জয়সিংহ প্রভৃতির চিত্র দেখাইল। রাজপুত্রী তাহা ফিরাইয়া দিলেন ; বলিলেন, "এও লইবনা। এ সকল হিন্দু নয়। ইহারা মুসলমানের চাকর।"

"তারপর রাজপুত্রী বলিলেন, 'আমি এই আলমগীর বাদশাহের চিত্রখানি মাটিতে রাখিতেছি। সবাই ইহার মুখে এক একটি বাঁ পায়ে লাথি মার। কার লাথিতে ইহার নাক ভাঙ্গে দেখি।"

"চঞ্চল কুমারী ধীরে ধীরে অলংকার শোভিত বামা চরণখানি ঔরংজেবের চিত্রের উপর সংস্থাপিত করিলেন—মড় মড় শব্দ হইল—ঔরংজেব বাদশাহ্‌র প্রতিমূর্তি রাজকুমারীর চরণতলে ভাঙ্গিয়া গেল।

রাজকুমারী হাসিয়া বলিলেন, আমার কি সাধ মিটিবেনা ? আমি কখনও জীবন্ত ঔরংজেবের মুখে এইরূপ ....." (রাজসিংহ ঃ চিত্রদল অধ্যায়।)

"মুসলমানেরা ডাকাত, চোয়াড়, গোরু খায়, শত্রু, তারা ছেলেই কি রাখিবে ?"–(সীতারাম ঃ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

বাংলার 'সাহিত্য সম্রাট' মুসলমানদের সম্পর্কে কিরূপ ঘৃণা ও বিদ্বেষপূর্ণ সাহিত্য রচনা করে গেছেন। বাঙ্গালী জাতীয়তা-প্রিয় 'মুসলমান বাঙ্গালীগণ' তাদের সাংস্কৃতিক গোঁসাইর চেহারাখানা এবার ভাল করে দেখে নিন্।

একদল লোক আজকাল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সাংস্কৃতিক গুরু বলতে অজ্ঞান। তারা তো প্রায় রবীন্দ্রনাথের পূজাই শুরু করে দিয়েছে। অথচ বাঙ্গালী সংস্কৃতির এ গুরুমশায় মুসলমানদের প্রতি চরম বিদ্বেষ পোষণ করতেন। তাঁর কবিতার মধ্যেও এ বিদ্বেষ ফুটে উঠেছে। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বন্দীবীর' কবিতার কিয়দংশ নিম্নে পড়ুন ঃ

"মোগল শিখের রণে
মরণ আলিংগণে
কণ্ঠে পাকড়ি ধরিল আঁকড়ি দুইজনা দুইজনে
দংশনক্ষত শ্যানবিহঙ্গ যুজে ভুজঙ্গ সনে।
সেদিন কঠিন রণে
'জয় গুরুজীর' হাঁকে শিখবীর সুগভীর নিঃস্বনে।
মত্ত মোগল রক্ত পাগল দীন্ দীন্ গরজনে ॥"

কবি রবীন্দ্রনাথের চোখে 'শিখ-বীর' আর মুসলমান হচ্ছে 'মত্ত মোগল রক্ত পাগল।' আর শিখের 'হাঁক' হচ্ছে 'জয় গুরুজী' আর মুসলমানের 'গর্জন' 'দীন্ দীন্।' এ দীন্ দীন্টা' কি মছিবত বলুনতো! মুসলমান যুদ্ধক্ষেত্রে 'আল্লাহু-আকবার' বলে, কিন্তু 'দীন্ দীন্' বলে গরজন করার কোন ইতহাস আছে কি ?

পুনরায় তাঁর 'হোরিখেলা' কবিতার কিছু অংশ শুনুন ঃ

"পত্র দিল পাঠান কেশর খাঁরে
কেতুন হতে ভূ নাগ রাজার রাণী,
'লড়াই করি আশ মিটিছে মিঞা ?
বসন্ত যায় চোখের উপর দিয়া,
এসো তোমার পাঠান সৈন্য নিয়া—
হোরি খেলব আমরা রাজপুতানী।'
যুদ্ধে হারি কোঠা শহর ছাড়ি
কেতুন হতে পত্র দিল রাণী ॥
পত্র পড়ি কেশর উঠে হাসি,
মনের সুখে গোঁফে দিল চাড়া।
রঙিন দেখে পাগড়ী পড়ে মাথে,
সুরমা আঁকি দিল আঁখির পাথে,
গন্ধ ভরা রুমাল নিল হাতে
সহস্রবার দাড়ি দিল ঝাড়া
পাঠান সাথে হোরিখেলবে রাণী—
কেশর হাসি গোঁফে দিল চাড়া।"

এ কবিতায় মুসলমানদের প্রাণ ভরে বিদ্রূপ করেছেন, বাঙ্গালী সংস্কৃতির গোঁসাই ঠাকুর কবি রবীন্দ্রনাথ। হিন্দু মানসিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে ভূ-নাগের রাণীকে দিয়ে পাঠানের কাছে প্রেম-পত্র পাঠিয়েছেন কবি গুরু মশায়। কেশর খাঁকে সাজিয়ে মুসলমানদের করেছেন বিদ্রূপ। আর পাঠান

সেনাপতি কেশর খাঁ যুদ্ধনীতির সকল সতর্কতামূলক ব্যবস্থা বাদ দিয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহও না করে হিন্দু রাণীর প্রতি আসক্ত হয়ে হোরি খেলতে চলে গেলেন। আর রাজপুত্রের সৈন্য সেনাপতি সকলকে হত্যা করলো। মুসলমান সৈন্যের আগমন সংবাদ শুনেই যাদের রাজা-মহারাজাগণ পেছনের দরজা দিয়ে পলায়ন করেছিল তারা এভাবেই কবিতা পুস্তকে আত্মপ্রসাদ লাভ করা ছাড়া আর কিই বা করতে পারেন ?

হিন্দু কবি, সাহিত্যিক, গাল্পিক ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধকারদের সকলেই মুসলমানদেরকে ভিন্ন জগতের জীব বিবেচনা করেছে। হিন্দু সাহিত্যে মুসলমান কখনও মর্যাদার স্থান লাভ করতে পারেনি। হিন্দু সাহিত্যিকগণ ভারতীয় কিংবা বাঙ্গালী সভ্যতা বলতে হিন্দু সভ্যতাই বুঝিয়েছে। সকল লেখকদের মন্তব্য নকল করে প্রমাণ পেশ করতে হলে একখানা বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ন দরকার। উপরে কয়েকজন প্রসিদ্ধ লেখকের যেসব উদ্ধৃতি পেশ করা গেল তা থেকেই হিন্দু মানসিকতা প্রকটভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বাঙ্গালী সংস্কৃতি হিন্দু সংস্কৃতিরই ছদ্মরূপ। আর এর সর্বগ্রাসী হামলা থেকে নিজস্ব সংস্কৃতির হেফাজতের জন্যই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল। আর আজকের বাংলাদেশও আগের পূর্ব-পাকিস্তান এলাকার উপরই প্রতিষ্ঠিত।

এ প্রসঙ্গে একথাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, হিন্দু সাহিত্যিকগণ হিন্দু সমাজেরই মনোভাব পেশ করেছিলো। গোটা হিন্দু সমাজটাই মুসলমানদের বিদেশী ও দুশমন মনে করতো। মুসলমান শাসনামলে হিন্দুজাতি একদিকে আরবী ফার্সী শিখে মুসলমানদের অধীনে চাকুরী করতো। মুসলিম শাসকদের সঙ্গে নিকটাত্মীয়দের বিয়ে দিয়েও সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করতে চেষ্টা করতো। অপর দিকে এরাই আবার মুসলমানদের পতন ঘটানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। ক্লাইভকে ডেকে নিয়ে এসে বাংলার স্বাধীনতা ইংরেজদের হাতে তুলে দেয়ার ব্যাপারে হিন্দু ষড়যন্ত্রই সক্রিয় ছিল। মীরজাফরকে তারা লোভ দেখিয়ে কার্য উদ্ধার করেছিল মাত্র।

ভারতীয় মুসলমানগণ বিশেষতঃ বাংলার মুসলমানগণ কখনও ইংরেজ শাসনকে মেনে নিতে পারেনি। যে দেশে শত শত বছর ধরে মুসলমানেরা শাসক-জাতি হিসাবে বসবাস করছে, সে দেশেই দূর দেশাগত বিধর্মী ইংরেজদের গোলাম হয়ে জীবন-যাপন করা তাদের জন্য ছিল খুবই পীড়াদায়ক। এজন্য মুসলমানগণ ইংরেজী শিক্ষা বর্জন করেছিল। ইংরেজের অধীন চাকুরী গ্রহণ করা তাদের নিকট অপমানজনক ছিল। বেনিয়া ইংরেজ সরকার মুসলমানদের এ অবস্থা দেখে হিন্দুদের সুযোগ-সুবিধা দিয়ে এ দেশে

ইংরেজ-শাসনের শিকড় মজবুত করতে শুরু করলো। আর বিক্ষুব্ধ মুসলমান ইংরেজদের বিরুদ্ধে করলো জিহাদ ঘোষণা। উত্তর পশ্চিম সিমান্ত প্রদেশে (বালাকোট) তারা একটি ইসলামী রাষ্ট্র স্থাপন করেছিল। সৈয়দ আহমদ বেরলভী শহীদের নেতৃত্বে পরিচালিত এ মুজাহিদ আন্দোলনে বাংলাদেশের মুসলমানগণ দলে দলে যোগদান করেন। অবশ্য তাদের এ আন্দোলন কামিয়াব হয়নি। কিন্তু মুসলমানরা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতে, ফাঁসীর মঞ্চে মরণ বরণ করতে এবং দ্বীপান্তরের সাজা গ্রহণ করতেও বিন্দুমাত্র ভয় পায়নি।

মিঃ ইউলিয়াম হান্টার মুসলমানদের তৎকালীন অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে তাঁর "দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান্‌স্" পুস্তকে লিখেছেন ঃ

"বর্তমান ইংরেজ সরকারের চাকুরীতে এমন একচেটিয়া অধিকার আশা করা মুসলমানদের পক্ষে অন্যায় হবে। কিন্তু এইরূপ তো তাদের আবেদনও নয়, অভিযোগও নয়। তারা একথা বলে না যে, রাষ্ট্রের একচেটিয়া সাহায্য থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে। তাদের অভিযোগ এই যে, তাদের ক্রমশঃ রাষ্ট্রের সকল রকম সাহায্য থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। তারা একথা বলে না যে, অতপর জীবন-যুদ্ধে তারা হিন্দুদের সঙ্গে সমান পাল্লায় দাঁড়াবে। তাদের দুঃখ এই যে, অন্ততঃ বাংলাদেশে তাদের ভাগ্যে কোনো সুযোগই মেলে না। সোজা কথায় মুসলমানেরা হয়েছে বিরাট গৌরবময় অতীতের অধিকারী, কিন্তু হালফিল একেবারে জীবনোপায় শূন্য।"–[বাংলা সংস্করণ ঃ ১৪৯ পৃঃ]

এ পুস্তকেরই আরও কয়েক স্থানে লেখক মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

"আমার মন্তব্যগুলো কেবল বাংলাদেশ সম্পর্কেই প্রযোজ্য–কারণ, আমি এ দেশটাকেই ভালমত জানি এবং আমার যতদুর জানা আছে, তাতে ধারণা হয় যে, এ দেশের মুসলমানেরাই বৃটিশ শাসনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।"
–[১৫৪ পৃঃ]

"চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা এই পরিবর্তন সূচিত হল না বরং চূড়ান্ত করা হলো। তার ফলে বড় বড় মুসলমান পরিবারগুলো মারাত্মক আঘাত প্রাপ্ত হলো। কারণ, এই বন্দোবস্তের আসল লক্ষ্য ছিল, যেসব নিম্নস্তরের হিন্দু কর্মচারীরা চাষীদের সঙ্গে সরাসরি কারবার করতো, তাদেরই জমির মালিক বা জমিদারী স্বীকার করা।"–[১৫৯ পৃঃ]

"আসল সত্য এই যে, যখন এ দেশটা আমাদের অধিকারে আসে, তখন মুসলমানেরা ছিল শ্রেষ্ঠ জাতি, তারা শুধু দরাজদিল ও সবল বাহু নিয়েই শ্রেষ্ঠ

ছিল না ; তারা সরকারী গঠনমূলক কাজে এবং শাসন পরিচালনা সংক্রান্ত হাতে-কলমের বিদ্যায়ও ওস্তাদ ছিল। তবু আজ মুসলমানদেরকে সরকারী চাকুরী এবং বেসরকারী কাজকর্ম থেকে সমানভাবে দূরে সরিয়ে দেয়া হয়েছে।"-[পৃষ্ঠা-১৬৭]

মুসলমান প্রধান বাংলাদেশে শিক্ষা-দীক্ষা ও চাকুরী ইত্যাদির ক্ষেত্রে মুসলমান এত পেছনে চলে গেল কি করে ? অথচ মাত্র পৌণে দু'শো বছর আগে মুসলমানেরাই ছিল সর্বক্ষেত্রে অগ্রসর ও শ্রেষ্ঠ জাতি। ইংরেজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র পাকিয়ে আমাদের 'বাঙ্গালী' প্রতিবেশীগণ মুসলমানদের এভাবে কোণঠাসা করে দিয়েছিল। হিন্দু জমিদার জমির খাজনা ছাড়াও মুসলমান চাষীদের নিকট থেকে নানাবিধ কর আদায় করতো। এমনকি হিন্দুদের পূজা পার্বণ এবং জমিদারের সন্তানাদি জন্ম উপলক্ষেও কর বা সালামী আদায় করতো। দাড়ি-ট্যাক্সসহ মুসলমান চাষীদের ২১ প্রকারের কর দিতে বাধ্য করা হতো।

মুসলমানদের শিক্ষা-দীক্ষার কোনো সুষ্ঠু ব্যবস্থা ছিল না। স্কুল-কলেজের পাঠ্য বিষয় সবই হিন্দুয়ানী ছিল। মুসলমানদের লুঙি, পাজামা ও টুপি হিন্দুদের নিকট বিদ্রূপের বস্তু ছিল। মুসলমান প্রজা হিন্দু জমিদারের কাচারীতে জুতা পায়ে ও ছাতা মাথায় দিয়ে যেতে পারতো না।

হিন্দু জমিদারগণ মুসলমানদের গরু কোরবানী করতে বাধা দিতো। হিন্দু মাত্রই ছিল 'বাবু'—আর মুসলমান 'নেড়ে'। মুসলমানের ছায়া মাড়ালেও হিন্দুদের 'চ্যান' (স্নান) করতে হতো। হিন্দু মুসলমানের ঘরে প্রবেশ করতে পারতো কিন্তু মুসলমান হিন্দুর ঘরে প্রবেশ করলে তাদের খাদ্য ও পানিয় সব অপবিত্র হয়ে যেতো ? চাকুরী ও ব্যবসা ক্ষেত্রে হিন্দু জাতির একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিল। মুসলমান ব্যবসা করতে চাইলে হিন্দু ব্যবসায়ীগণ প্রতিযোগিতা করে তাকে লোকসান দিয়ে ব্যবসাক্ষেত্র পরিত্যাগ করতে বাধ্য করতো। কোনো হিন্দু খরিদ্দার মুসলমানের দোকান মাড়াত না। হিন্দু জমিদারগণ মুসলমানদের লেঠেল, পাইক ও বড়কন্দাজ হিসাবেই দেখতো। সর্বক্ষেত্রে এ উপেক্ষা ও ঘৃণার বিরুদ্ধে মুসলমান কখনও প্রতিবাদ করতে চাইলেই তারা বাঙ্গালীত্বের ধূয়া তুলে মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক ও সংকীর্ণমনা আখ্যা দিয়েছে। অর্থাৎ বিনা প্রতিবাদে ও 'শান্ত সুবোধ ছেলের মত হিন্দু-শোষণ ও যুলুমের নিকট আত্মসমর্পণ করাই বাঙ্গালীত্ব ? নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠাই ছিল 'সম্প্রদায়িকতা' ?

সে যুগেও এক শ্রেণীর মুষ্টিমেয় হিন্দু-ঘেষা মুসলমান নিজেদের 'বাঙ্গালী ও 'ভদ্র' প্রমাণ করার জন্য ধূতী পরা থেকে শুরু করে সকল হিন্দুয়ানী চাল-চলন

গ্রহণ করেছিল। এমন কি মুসলমানী নাম পর্যন্ত পালটিয়ে 'গোপাল মণ্ডল' ও 'নবীন বিশ্বাস' জাতীয় নাম ধারণ করেছিল। তারা গো-মাংস বর্জন করেও হিন্দুদের প্রিয় হতে চেষ্টা করেছে। তথাপি হিন্দু সমাজ তাদেরকে অস্পৃশ্যতার সারি থেকে কাছে টেনে নেয়নি। তৎকালীন পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধী মুসলমানদের মধ্যেই তাদের খুঁজে পাওয়া যাবে। হুমায়ুন কবির, আসফ আলী প্রমুখ নেতাগণ এক একটি হিন্দু মহিলার পানি গ্রহণ করে পাকিস্তান আন্দোলনের ঘোর বিরোধিতা করেছিলেন।

কিন্তু কাশ্মীরের শেখ আবদুল্লাহর মত আজ তারা জঘন্য হিন্দু মানসিকতার পরিচয় নিশ্চয়ই পেয়েছেন। কাজেই এটা অনস্বীকার্য যে, হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতি এক নয়, এক হতেও পারে না। মুসলমান "বাঙ্গালী" সেজে হিন্দু নেতা ও সাহিত্যিকদের গুরু হিসাবে বরণ করে নিলেও হিন্দু সমাজ কখনও মুসলমানকে আপনজন হিসাবে গ্রহণ করবে না—করতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিম চ্যাটার্জী প্রমুখ ঘোর মুসলিম বিদ্বেষীদের বাঙ্গালী সাংস্কৃতিক গুরু হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যারা জোরেশোরে আন্দোলন করছেন তাদের নিকট জিজ্ঞাসা করি, বাঙ্গালী সংস্কৃতি কোন্ বস্তুটির নাম ? শারদীয় পূজা, স্কুল-কলেজের সরস্বতী দেবীর পূজা, স্তবস্তুতি, অর্চনা-বন্দনা, সন্ধ্যা-আরতি, ভজন কীর্তন রামপ্রসাদী, মনসা ভাসান, নাটক, যাত্রা, কবিগান, মঙ্গলঘট, আল্পনা, সিন্দুর, শাঁখা ইত্যাদিই কি বাঙ্গালীত্বের মাল-মসলা ? এর কোন্টি পরিত্যাগ করলে বাংলাদেশের উপর আসমান ভেঙ্গে পড়বে ? আর এগুলোর কোন বিষয়টি গ্রহণ করে বাংলাদেশী মুসলমান ধন্য হতে পারবে ? বাঙ্গালীর কোন্ বিষয়টি প্রতিষ্ঠার জন্য এ সংগ্রাম ? অন্ধ ভাবাবেগ পরিত্যাগ করে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখতে হবে, 'বাঙ্গালীত্ব' বস্তুটা কি ? বাঙ্গালী সভ্যতা সংস্কৃতির সঙ্গে হিন্দু, সভ্যতা, সংস্কৃতির কোনো পার্থক্য আছে কি ? তবে কি আমাদের আজ হিন্দুত্ব গ্রহণ করতে হবে

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ভারতীয় হিন্দুদের খুব উৎসাহ্ দেখা গিয়েছিল। বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে গেলে তারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। বাংলাদেশের তৎকালীন শাসকগণ ভারতীয়দের সাহায্য ও বন্ধুত্বের গুণকীর্তনে পঞ্চমুখ ছিলেন এবং ভারতের বিরুদ্ধে কোনো শব্দ উচ্চারণকারীদের সম্পর্কে কঠোর সতর্কবাণী বারবার উচ্চারণ করেছেন। সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে ইন্দ্রিরা মঞ্চ তৈরী করে ইন্দিরা দেবীকে যেভাবে তারা রীতিমত পূজা-অর্চনা করেছিলেন, তা দেশবাসীকে বিস্ময়াভিভূত করেছিল। কিন্তু এত করেও কি আমরা বাঙ্গালী হতে পেরেছি। পশ্চিম বাংলার হিন্দু

সাহিত্যিকগণ কি আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার বন্ধ করেছে ? আসুন, এবার দেখা যাক আমাদের বন্ধুত্বের দাবীদার লেখকগণ আমাদের সম্পর্কে কি মনোভাব পোষণ করেন।

পশ্চিম বাংলার প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক প্রবোধ কুমার সান্যাল তার রচিত 'হাসু বানু' উপন্যাসে এক জায়গায় মন্তব্য করেন।

'মুসলমানেরা জানে, মেয়ে চুরির উপর তাদের সংখ্যা বেড়েছে। -------- বাঙ্গালী হিন্দু বাঙ্গালী মুসলমানের সামাজিক পরিচয় জানতে না চাওয়াই ভালো, বেললিক মশাই।"

(হাসু বানু ঃ প্রবোধ কুমার স্যান্যাল ঃ পঞ্চম মুদ্রণ ১৩৭৬ বাংলা ১৯৭৪ সালে মে মাসের মাঝামাঝি সময় জনসংঘের প্রেসিডেন্ট অটল বিহারী বাজপেয়ী দিল্লীর আকাশবাণী থেকে প্রচারিত এক বেতার ভাষণে ঘোষণা করে যে, ভারত মাতার সঙ্গে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান সংযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলবেই।–(সত্য সমাগত ব্যারিষ্টার এম, এ, সিদ্দীকি ঃ ১৮ পৃঃ)

বসন্ত চাটার্জী তার ইন্‌সাইড বাংলাদেশ টুডে (১৯৭৬), পুস্তকে উদ্ধৃত বাংলাদেশী মুসলমানদের সম্পর্কে কি মন্তব্য করেন তাও নিম্নে বর্ণনা করছি।

"বাংলায় শুধু দু'টিমাত্র শ্রেণী রয়েছে। একটি ছোটলোক যার অন্তর্ভুক্ত হল মুসলমানেরা এবং অন্যটি মাত্র উচ্চবর্ণের হিন্দুর দ্বারা গঠিত ভদ্রলোক। বাঙ্গালী ভদ্রলোকের প্রধানতঃ বাংলার তিনটি সুপরিচিত বর্ণ হিন্দু দ্বারা গঠিতঃ যথা ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ। যত স্বাভাবিকভাবেই সে বাংলা ভাষায় কথা বলুক না কেন অথবা তার সামাজিক মর্যাদা যা-ই হোকনা কেন, সর্বপ্রাণবাদী হিন্দু বা মুসলমান অথবা অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের সদস্যরা কখেনো বাঙ্গালী বলে বিবেচিত হতে পারে না।"

'আজকের বাংলাদেশে বাঙ্গালী মুসলিম সংস্কৃতির কথা খুবই শোনা যায়। কিন্তু সত্য কথাটা এই যে, বাঙ্গালী মুসলিম সংস্কৃতি বলে কোনো জিনিস নেই। অবশ্য বাঙ্গালী সংস্কৃতি আছে, খুবই নির্দিষ্ট খুবই সংগঠিত এক সুউন্নত এক সংস্কৃতি ..... কিন্তু সে সংস্কৃতির শতকরা ১০০ ভাগই হিন্দু।

উপরোক্ত আলোচনার পর বাঙ্গালী জাতীয়তার আসলরূপ সকলের নিকটই স্পষ্ট হয়ে যাবে বলে আশা করি। এদেশের কোনো মুসলমানই বাঙ্গালী জাতীয়তার আবরণে হিন্দুত্ব গ্রহণ করতে রাজী নয়। তাই আমরা বাংলাদেশী।

অর্থাৎ মুসলিম জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে রচিত বাংলাদেশের অধিবাসীবৃন্দ মুসলমান হিসাবেই বাঁচতে ও মরতে চায়। বাঙ্গালী জাতীয়তা হিন্দু চক্রান্তেরই ফল। তাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস—যারা ভুলধারণার বশবর্তী হয়ে বাঙ্গালী জাতীয়তার ফাঁদে পা দিয়েছিলেন—তারা আর ওপথে পা বাড়াবেন না।

-ঃ সমাপ্ত ঃ-

আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১

বিক্রয় কেন্দ্র

৪৩৫/২-এ, বড় মগবাজার,
(ওয়ারলেস রেলগেট)
ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৩৯৪৪২

১০, আদর্শ পুস্তক বিপণী
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।